অভিন্ন নদীর সংখ্যা : বিভ্রান্তি ও নিরসন

মাহবুব সিদ্দিকী

আন্তঃ সীমান্ত নদী (Transboundary River/Water Course) বা অভিন্ন নদী (United River) হচ্ছে এমন নদ-নদী, যেগুলো দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এগুলো আন্তর্জাতিক নদী (International River) হিসেবেও পরিচিত বা চিহ্নিত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক নদী বলতে কেবলমাত্র অন্য দেশ থেকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে কিংবা বাংলাদেশে উৎপত্তি লাভ করে সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে গেছে – এজাতীয় নদ-নদীকেই বোঝায় না; বরং বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানা নির্ধারণকারী নদীকেও বোঝায়। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে আন্তসীমান্ত নদীর সংখ্যা নিয়ে সরকারি স্বীকৃত সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং সরেজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আরও অনেকগুলো নদী চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো এখনও অস্বীকৃত।

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি নদী বিষয়ক কনভেশন, যেটি হেলসিংকি কনভেনশন নামে খ্যাত (Convention on the protection and use of Transboundary Water Course and International Lakes, Helsinki, 1992)। উক্ত কনভেনশনে আন্তঃ সীমান্ত নদীর যে সংজ্ঞা দেয়া আছে সেটি হল : দুই বা ততোধিক দেশের সীমান্ত অতিক্রমকারী ভূ-উপরস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানিপ্রবাহ ভিত্তিক যেসব নদ-নদী সেগুলোই আন্তঃ সীমান্ত নদী। বলা হয়েছে, "Transboundary Waters means any surface or ground water which mark, cross or are located on boundaries between two or more states, wherever transboundary waters flow directly into the sea. These transboundary waters end at a straight line across their respective mouths between points of the low water line of their banks."

এতকাল পর্যন্ত আমরা জেনে এসেছি যে বাংলাদেশে আন্তঃ সীমান্ত বা অভিন্ন নদী রয়েছে সর্বমোট ৫৭টি। এর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত ও বাংলাদেশের সাথে এবং অবশিষ্ট ৩টি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সাথে। আসলে এই সংখ্যাগুলো নির্ধারণ হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার যৌথ নদী কমিশন–এদের দ্বারা পরিচালিত অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে। এই সংখ্যা উল্লিখিত যৌথ নদী কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত। ইদানীংকালে পাওয়া বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সরেজমিন বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করে (সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা) জানা গেছে, যৌথ নদী কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশ-ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যকার অভিন্ন নদীর সংখ্যা নির্ভুল নয়। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য মতে, এজাতীয় নদ-নদীর সংখ্যা মোট ১০৭টি। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ১০২টি নদী এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সাথে অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫টি।

বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ১০২টি অভিন্ন নদীর মধ্যে সরাসরি ভারতসহ ভুটান ও চীন থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এমন নদ-নদীর সংখ্যা ৯৬টি। অবশিষ্ট ৬টি নদী উৎপত্তি লাভ করেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। এগুলো বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশ করেছে। এই নদীগুলো হচ্ছে কুলিক, বেরং, ভেরসা, রাক্ষসিনী তেঁতুলিয়া বা তুলাই, লোনা বা নোনা ও ভাতা। এই ৬টি নদীর মধ্যে কুলিক ও রাক্ষসিনী তেঁতুলিয়া বা তুলাই নদী দুটি যৌথ নদী কমিশনের তালিকাভুক্ত ৫৪টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট ৪টি নদী তালিকাবহির্ভূত। অভিন্ন নদীর তালিকাবহির্ভূত চিরি নামক নদীটি দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলা এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে ভারতে প্রবেশ করেছে, পুনরায় ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর নওগাঁ জেলাধীন ছোট যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। তালিকাবহির্ভূত অপর একটি নদী ইছামতি (দিনাজপুর), যেটি স্থানীয়ভাবে ঘুকসী নামে পরিচিত বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলাধীন খানসামা উপজেলায় উৎপত্তি লাভ করে ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট থানা অতিক্রম করে বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় প্রবেশ করেছে। ভাটির অংশে এটি খুকসী বা ঘুকসী নামে পরিচিত। অন্য ৬টি নদী বাংলাদেশে জন্ম লাভ করে সীমান্ত অতিক্রমপূর্বক ভারতে প্রবেশ করেছে। এই নদীগুলোর পতিতমুখ ভারতের অভ্যন্তরে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যৌথ নদী কমিশনের তালিকাবহির্ভূত ৪৮টি নদ-নদীর মধ্যে ৪৪টি সরাসরি ভারতের সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদীগুলোর পতিতমুখ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। তালিকাবহির্ভূত এই নদীগুলো হচ্ছে কর্ণফুলী, লুভা, আমরি, শিয়ালদহ, গঙ্গাধর, ফুলকুমার, হাড়িয়াভাঙ্গা, চাওয়াই, গিদারী, কুরুম, পাঙ্গা, রেংখিয়াং, কাসাল, মাইনি, মালদাহা, সিমলাজান, উপাদাখালী, কর্ণঝারা, কর্ণবালজা, কালাপানি, খাসিমারা, ঘাগটিয়া, চেলা, জাফলং-ডাউকি, জালিয়াছড়া, দুধদা, নয়াগাংজৈন্তাপুর, মহারশি, সোমেশ্বরী (ধর্মপাশা), সোমেশ্বরী শ্রীবর্দী, ঘুংঘুর, ডাকাতিয়া, লহর, গুকসী বা ঘুকসী, চিংগ্রী বা চেঙ্গি, যমুনা (পঞ্চগড়), সিংগিমারী, সাউ, আলাইকুমারী, সুই, হাড়িয়া, চিরি বা শ্রীনদী, সংকোশ ও হাড়িয়া। তালিকাবহির্ভূত অবশিষ্ট ৪টি নদী, যেমন – বেরং, ভেরসা, লোনা ও ভাতা–এগুলো বাংলাদেশে জন্মলাভ করে ভারতে পতিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা নিয়েও দেখা যাচ্ছে পার্থক্য। যৌথ নদী কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে আন্তঃ সীমান্ত নদীর সংখ্যা হচ্ছে ৩টি। এগুলো হল নাফ, শঙ্খ ও মাতামুহুরী; যদিও শঙ্খ ও মাতামুহুরী নদী দুটির উৎপত্তিস্থল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে অনেক। একদল গবেষক বলেছেন, এই দুটি নদীর উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। সরকারিভাবে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন প্রতিবেদন বা বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায়নি। তবে সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা গেছে, শঙ্খ ও মাতামুহুরী নদীর উৎসস্থল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। সে ক্ষেত্রে এই নদী দুটির বিষয়ে সরকারিভাবে পরিদর্শকদল পাঠিয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে উলিখিত ৩টি নদী ছাড়াও আরও ২টি অভিন্ন নদীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। তালিকাবহির্ভূত নদী দুটি হচ্ছে

রেজু ও বাঁকখালী। রেজু নদীটি স্থানীয়ভাবে রেজু খাল নামে পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল উত্তর আরাকান পর্বতমালার কালাপাহাড়। এখান থেকে উৎপত্তি লাভ করে কক্সবাজার জেলার দক্ষিণ সীমানা ঘেঁষে প্রবাহিত হয়েছে। কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সোজা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। রেজু নদী মোট ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে তালিকাবহির্ভূত আরেকটি অভিন্ন নদী বাঁকখালী। নদীটি আরাকানের পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করে উখিয়া-রামু হয়ে কক্সবাজারের কস্তুরাঘাটে এসে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে। বাঁকখালী নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১০৫ কিলোমিটার। রামুতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ প্রতিবছর বাঁকখালী নদীর তটে জাহাজভাসা উৎসব পালন করে থাকে। এটি এদের ২০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্য।

উল্লিখিত ২টি নদীর ক্ষেত্রে অবিলম্বে সরকারি পরিদর্শকদল গঠন করে সরেজমিন জরিপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত পৌঁছানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উলিখিত ৪৮টি এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে উল্লিখিত অতিরিক্ত ২টি আন্তঃ সীমান্ত নদী (এখন অবধি প্রাপ্ত তথ্য মতে) যৌথ নদী কমিশন কর্তৃক আজ অবধি কেন চিহ্নিত ও স্বীকৃত হল না এটি বেশ বিস্ময়ের এবং অবাক করার মত ঘটনা। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, উলিখিত নদীগুলোর মধ্যে অনেকগুলো নদী রয়েছে, যেগুলো বছরের বেশির ভাগ সময় স্রোত বহন করছে। শুষ্ক মৌসুমে এখানকার পানি ব্যবহার করে ফসল ফলানো হচ্ছে। এজাতীয় বেশ কয়েকটি নদীর উজানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাঁধ নির্মাণ করে ব্যবহার করছে। আমরা এতকাল জেনেছি, অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫৭টি। অতিরিক্ত ৫০টি নদ-নদীর তথ্য জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষকে জানানো অতীব জরুরি। যৌথ নদী কমিশনের উচিত হবে এ ব্যাপারে অতি সত্বর সীমান্ত এলাকার নদ-নদী সম্পর্কে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করে আন্তঃ সীমান্ত নদীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক জাতিকে অবহিত করা।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উল্লিখিত ৪৮টি এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে উল্লিখিত অতিরিক্ত ২টি আন্তঃ সীমান্ত নদী (এখন অবধি প্রাপ্ত তথ্য মতে) যৌথ নদী কমিশন কর্তৃক আজ অবধি কেন চিহ্নিত ও স্বীকৃত হল না এটি বেশ বিস্ময়ের এবং অবাক করার মত ঘটনা।

তালিকাবহির্ভূত অভিন্ন নদ-নদীর বিষয়ে খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম–এই জেলাগুলোতে প্রাথমিকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন করে এবং অন্য জেলাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আপাতত ৪৮টি নদ-নদীর নাম পাওয়া গেছে, যেগুলো এখনও যৌথ নদী কমিশনের তালিকাভুক্ত হয়নি। উল্লিখিত সীমান্তবর্তী জেলাগুলোসহ আরও অনেক সীমান্তবর্তী জেলা রয়েছে, যেখানে সরেজমিন পরিদর্শন করা অত্যন্ত জরুরি। এই জেলাগুলো হল জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিলা, ফেনী, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান। এই জেলাগুলোতে যদি সঠিক পদ্ধতিতে সরেজমিন জরিপ করা হয় তাহলে বাংলাদেশ-ভারত এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সাথে অভিন্ন নদ-নদীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের পাহাড় থেকে বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে নেমে আসা এমন অনেক নদ-নদী রয়েছে, যেগুলোর তালিকা পাওয়া গেলে এই সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের দেশের কোন কোন নদী বিশেষজ্ঞ পাহাড়ি এমন অনেক নদী রয়েছে, যেগুলোকে পাহাড়ি ছড়া আখ্যা দিয়েছেন। অথচ নদীর সংজ্ঞায় এসব পাহাড়ি প্রবাহ নিঃসন্দেহে একেকটি নদী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মেঘালয়ের জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করা লুভা নামের নদীটি মেঘালয়ে কাও উম (Kaw Um) নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের সিলেটে প্রবেশ করে সুরমা নদীতে পতিত হয়েছে। এই নদীটি সুরমার উপনদী। অথচ এই নদীটিকে ছড়া আখ্যা দিয়ে নদী হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বি সি অ্যালেন (B. C. Allen) কর্তৃক সম্পাদিত ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Assam District Gazeetteers Volume-X "The Khasi and Jaintia Hills" নামক গ্রন্থের ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত লুভা নদী ছাড়াও আরও কয়েকটি নদীর নাম বলা আছে, যেগুলো নিশ্চিতভাবে নদী এবং বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদী বা আন্তঃ সীমান্ত নদীর মধ্যে গণ্য।

তালিকাবহির্ভূত নদ-নদীর তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকার নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা পরিদর্শনকালে আমার সঙ্গে ছিলেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১১ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের নদ-নদী' (দ্বিতীয় সংস্করণ) নামক গ্রন্থে তালিকাবহির্ভূত অভিন্ন নদ-নদীর বর্ণনা রয়েছে; যদিও উক্ত গ্রন্থের অনেক স্থানে কিছু তথ্যের বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়েছে।

তালিকাবহির্ভূত অভিন্ন নদ-নদী

১. পাঙ্গা

বাংলাদেশের ঘোড়ামারা নদীর উজানের প্রবাহটি ভারতে পাঙ্গা নামে পরিচিত। এই নদী উৎপত্তি লাভ করেছে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্য ও পাহাড়ি এলাকায়। উৎসস্থল থেকে দক্ষিণ-পূর্বমুখী প্রবাহপথে প্রথমে জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তিনগর থানা অতিক্রম করেছে। এরপর আরও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে জলপাইগুড়ি সদর থানা এলাকার মণ্ডলঘাটকে পূর্ব দিকে রেখে আরও প্রায় ১০ কিলোমিটার সোজা দক্ষিণমুখী প্রবাহপথ অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পাঙ্গা ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের পথে নদীর উভয় পারের ভারতের শেষ গ্রাম দুটি হচ্ছে পূর্বপারে জংলীটারী এবং পশ্চিম পারে দেউনিয়াপাড়া।

পাঙ্গা বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলাধীন সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের প্রথম গ্রামটি হচ্ছে নদীর পূর্ব পারে পূর্ব জয়ধরডাঙ্গা ও নমলা গ্রাম এবং নদীর পশ্চিম পারে পশ্চিম জয়ধরডাঙ্গা ও বানিয়াপাড়া গ্রাম। পূর্ব ও পশ্চিম জয়ধরডাঙ্গা গ্রাম দুটি অতিক্রম করার পর পাঙ্গা প্রথমাবস্থায় প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ভারতের দফাদারপাড়া নামক একটি গ্রামে প্রবেশ করেছে। ভারতে প্রবেশের মুখে নদীর ওপর একটি লোহার সেতু রয়েছে। দফাদারপাড়ায় রয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ ক্যাম্প। ভারতে প্রবেশের পূর্বে বাংলাদেশের শেষ গ্রাম বানিয়াপাড়া। পাঙ্গা প্রথমাবস্থায় বাংলাদেশে প্রবেশের পর অনুমান এক কিলোমিটার সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এসে জয়ধরডাঙ্গা নামক গ্রামে পৌঁছে যায়। এখানে পাঙ্গা নদীর ওপর ৬৩ মিটার দীর্ঘ পাকা

সেতু নির্মিত হয়েছে। ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার সেতুটি উদ্বোধন করেছেন ০৬-০৬-২০০৫ খ্রিস্টাব্দে।

পাঙ্গা প্রথমাবস্থায় প্রায় আড়াই কিলোমিটার বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারতের দফাদারপাড়া গ্রামে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ অংশে নদীর উভয় পারের গ্রামগুলো হল পশ্চিম ও পূর্ব জয়ধরডাঙ্গা, নমলা, ভুজারীপাড়া, বানিয়াপাড়া, কামারপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া। উলিখিত সেতুটি নমলা ও ভুজারীপাড়ার মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। নদীর পশ্চিম পারের জয়ধরডাঙ্গা গ্রামে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে একটি পাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের শেষ গ্রাম বানিয়াপাড়া অতিক্রম করে পাঙ্গা পুনরায় ভারতের অভ্যন্তরে দফাদারপাড়া গ্রামে প্রবেশ করেছে। এই স্থানটি জলপাইগুড়ি জেলার মানিকগঞ্জ থানার অধীনে। ভারতের অভ্যন্তরে মানিকগঞ্জ থানা সদরের পাশ দিয়ে পাঙ্গা অনুমান দেড় কিলোমিটার চলার পর বাংলাদেশে প্রবেশ করে মাত্র আধা কিলোমিটার অতিক্রম করে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। এ অবস্থায় মাত্র সামান্য কিছু পথ পেরিয়ে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলাধীন বড়শশী ইউনিয়নের বড়শশী কাজীপাড়া নামক গ্রামে প্রবেশ করেছে। বড়শশী কাজীপাড়া গ্রাম থেকে পাঙ্গা নামেই দক্ষিণমুখী প্রবাহপথে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নাউতারি সরকারপাড়া এবং শামেরডাঙ্গা নামক স্থানে এসে পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে ঘোড়ামারা নাম ধারণ করেছে।

সারা বছরই পাঙ্গা প্রবহমান। সব সময়ই স্রোত রয়েছে। শুষ্ক মৌসুমেও স্রোত থাকে। সারা বছর নদীতে মাছ পাওয়া যায়। বর্ষায় দুই কূল ছাপিয়ে প্লাবিত হয়। শুষ্ক মৌসুমে নদীর গভীরতা গড়ে ৪ ফুট। বর্ষাকালে গভীরতা দাঁড়ায় ১০ ফুট পর্যন্ত। পাঙ্গা নদীর বাংলাদেশ অংশে দ্বিতীয় আরেকটি পাকা ব্রিজ রয়েছে চাকলাহাট ইউনিয়নের অধীন খুনিয়াপাড়া নামক গ্রামে। সিংরোড রতনীপাড়া হাট থেকে পাকা রাস্তা যোগে এক কিলোমিটার পর পাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত দ্বিতীয় পাকা সেতুতে যাওয়া যায়। আসলে পাঙ্গা নদীর স্রোত দিয়েই ঘোড়ামারা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং প্রকারান্তরে আরও ভাটিতে গিয়ে করতোয়া ও আত্রাই সমৃদ্ধ হয়েছে।

> আমাদের দেশের কোন কোন নদী বিশেষজ্ঞ পাহাড়ি এমন অনেক নদী রয়েছে, যেগুলোকে পাহাড়ি ছড়া আখ্যা দিয়েছেন। অথচ নদীর সংজ্ঞায় এসব পাহাড়ি প্রবাহ নিঃসন্দেহে একেকটি নদী।

২. কুরুম

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তালিকাবহির্ভূত আরেকটি অভিন্ন নদ কুরুম। কুরুম নামের আন্তঃ সীমান্ত এই নদীটি উৎপত্তি লাভ করেছে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরে অবস্থিত পাহাড় এবং অরণ্যভূমি থেকে। জলপাইগুড়ি জেলাধীন বেরুবাড়ী থানা অতিক্রম করে কুরুম বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলাধীন সদর উপজেলার হাড়িভাসা নামক ইউনিয়ন এলাকায় প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশের পূর্বে ভারতের অংশে নদীর ওপর প্রায় ৬৫ মিটার দীর্ঘ একটি পাকা সেতু রয়েছে। বাংলাদেশে প্রবেশের মুখে ভারতের শেষ গ্রাম পশ্চিম প্রান্তে চন্দন ডাঙ্গা এবং পূর্ব প্রান্তে প্রধানপাড়া নামক গ্রাম। প্রধানপাড়া গ্রামে ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ ক্যাম্প। উক্ত ব্রিজ অতিক্রম করে নদীর উভয় পারেই ভারত। এখানে নদীর পার দিয়ে চা বাগান রয়েছে। কুরুম উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী অবস্থায় অগ্রসর হওয়ার পথে নদীর পশ্চিম পারে প্রথম বাংলাদেশের গ্রামের নাম ঘাগরাপাড়া এবং পূর্ব দিকে ভারতের ফকিরপাড়া। ভারতের এই গ্রামটি কুরুমের পূর্ব পার দিয়ে প্রায় পৌনে এক কিলোমিটার লম্বা। এর পরেই নদীর পূর্ব পার দিয়ে বাংলাদেশের গের্দ্দনালাগঞ্জ নামক গ্রামের শুরু। এই গ্রামটি কুরুমের পূর্ব পার দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ। গের্দ্দনালাগঞ্জ গ্রামের পর কুরুমের পূর্ব পাড়ে প্রায় আধা কিলোমিটারব্যাপী ভারতের সিংগিমারী গ্রামটি বিস্তৃত। সিংগিমারী গ্রামের পর থেকে বাংলাদেশের অংশ পুনরায় শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে নদীর পূর্ব দিকের গ্রামটির নাম পাহাড়বাড়ী। নদীর পশ্চিম পারে বাংলাদেশের প্রথম গ্রাম ঘাগরাপাড়া ও নালাগঞ্জ। নালাগঞ্জ গ্রামের শেষ প্রান্তে ৪০ ফুট দীর্ঘ একটি কালভার্ট। এর নিচ দিয়ে তিস্তাভাঙ্গা নামে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে সামান্য ৪০ গজ পূর্ব দিকে গিয়ে কুরুম নদে পতিত হয়েছে। তিস্তাভাঙ্গা নদী পঞ্চগড় সদর উপজেলার অমরখানা ইউনিয়নের টোকাপাড়া কান্দর থেকে উৎপত্তি লাভ করে তিন কিলোমিটার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নালাগঞ্জ নামক গ্রামে এসে কুরুম নদে পতিত হয়েছে। পাহাড়বাড়ি গ্রামে কুরুম নদের ওপর একটি পাকা সেতু নির্মিত হয়েছে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। এটি প্রায় ৮৫ মিটার লম্বা। কুরুম ভারত সীমান্তে অবস্থিত পাকা সেতুর পর থেকে অর্থাৎ প্রধানপাড়া থেকে বাংলাদেশের পাহাড়বাড়ি ব্রিজ পর্যন্ত মোট সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে।

কুরুম নদ পাহাড়বাড়ি পাকা ব্রিজ অতিক্রম করে আরও প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। হাড়িভাসা ইউনিয়ন পরিষদ এবং হাড়িভাসা বাজারকে পাশে রেখে একটি লোহার ব্রিজের নিচ দিয়ে পূর্বমুখী পথে অগ্রসর হয়েছে। এ অবস্থায় পাহাড়বাড়ি ব্রিজ থেকে লোহার ব্রিজ পর্যন্ত (ভুজারীপাড়া) নদীর পূর্ব পারের গ্রামগুলো হল পাহাড়বাড়ি, নাককাটি, গোছপাড়া, মাটিয়াপাড়া, অধিকারীপাড়া, মোহনবাগান। কুরুমের পশ্চিম পারের গ্রামগুলো হল জিন্নতপাড়া জামুরীপাড়া, শালুকপাড়া, পাইকানিপাড়া, হাড়িভাসা বাজার এবং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়। হাড়িভাসা কুরুম নদের তীরবর্তী একটি নদীবন্দর ছিল। বর্তমানে নাব্যতা হারিয়ে নৌচলাচল ব্যাহত হয়েছে। কুরুম নদের আরেকটি উপনদী পাইকানি। এই নদীটি উৎপত্তি লাভ করেছে হাড়িভাসা ইউনিয়নের পাইকানি নামক গ্রামের কান্দর বা নিম্ন জলাভূমি থেকে। নদীতে সারা বছর পানি থাকে। নদীর দুই পাশের ফসলি জমিগুলোতে শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য পাইকানি নদীর পানি ব্যবহৃত হয়। নদীটির গতিপথের উভয় পাশেই পাইকানি নামক গ্রাম। মাটিয়াপাড়া গ্রামে এসে পাইকানি কুরুম নদে পতিত হয়েছে। পাইকানির দৈর্ঘ্য ৩ কিলোমিটার। গড় প্রস্থ ১৫ মিটার।

কুরুম হাড়িভাসা থেকে পূর্বমুখী হয়ে কিছুদূর আসার পর হঠাৎ করেই উত্তরমুখী হয়েছে। এভাবে সামান্য কিছুটা পথ অগ্রসর হয়ে পুনরায় পূর্বমুখী হয়ে খোপরাকান্দি গ্রামে এসে উল্লিখিত লোহার ব্রিজ অতিক্রম করেছে। এভাবে প্রায় দেড় কিলোমিটার বয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সোজা দক্ষিণমুখী হয়ে চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চাকলাহাট বাজারের নিকট পৌঁছে গেছে।

বাংলাদেশে প্রবেশের পর থেকে চাকলাহাট বাজারের পূর্ব দিক পর্যন্ত প্রবাহপথে মোহনবাগান নামক গ্রামে নদীর পূর্ব কূলে একটি শ্মশানঘাট এবং লোহার ব্রিজ অতিক্রম করার পর ভুজারীপাড়া গ্রামে আরেকটি শ্মশানঘাট রয়েছে। চাকলাহাট বাজারের পূর্ব দিক দিয়ে কুরুম উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবহমান। এখানে পর পর দুটি পাকা সেতু। একটি সামান্য উঁচু এবং প্রশস্ত। এখান থেকে কুরুম নদ প্রায় ছয়

কিলোমিটার পথ প্রধানত দক্ষিণমুখী অবস্থায় সর্পিলাকারে প্রবাহিত হয়েছে। ভারতের সীমান্ত ফাঁড়ি ঝাপেরতলা বিএসএফ ক্যাম্পের পূর্ব পাশ দিয়ে প্রথমে সামান্য পূর্বমুখী পথে প্রবাহিত হয়ে এরপর সম্পূর্ণ দক্ষিণমুখী বাঁক নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। ভারতে প্রবেশের মুখেই প্রায় ৫০ মিটার লম্বা একটি বেইলি ব্রিজ রয়েছে ভারতীয় অংশে। এখানে বিএসএফ ক্যাম্পের টহল ফাঁড়ি এবং টাওয়ার রয়েছে। ঝাঁপেরতলা থেকে জলপাইগুড়িমুখী পাকা রাস্তায় কুরুম নদের ওপর উক্ত ব্রিজটি নির্মিত।

কুরুম চাকলাহাট ত্যাগ করে ভারতের ঝাঁপেরতলা পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পথে নদীর উভয় পারের গ্রামগুলো হল বীরপাড়া, ভাটিয়াপাড়া, মুন্সীপাড়া, বকসীপাড়া এবং শেষ সীমান্ত গ্রাম নারায়ণপুর ডাঙ্গাপাড়া। কুরুম ভারতে প্রবেশের পর অনুমান এক কিলোমিটার পথ অগ্রসর হয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মানিকগঞ্জ থানাধীন খৈয়েরবাড়ী নামক স্থানে এসে যমুনা নামে আরেকটি অভিন্ন নদীর সাথে একত্রিত হয়েছে। মিলিত স্থানটি বা কুরুম/যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলটি দোমুখা নামে পরিচিত।

বাংলাদেশ অংশে কুরুমের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮ কিলোমিটার। এই নদের সর্বোচ্চ প্রশস্ততা ৮০ মিটার এবং সর্বনিম্ন ১৫ মিটার। সারা বছর বহমান কুরুম নদে শুষ্ক মৌসুমে (২২.০৮.২০১৭) ক্ষীণ প্রবাহ লক্ষ করা গেছে। এই সময়ে এর গভীরতা ছিল ৩ থেকে ৪ ফুট। ভরা বর্ষায় ৮ ফুট পর্যন্ত গভীরতা লক্ষ করা যায়।

৩. গিদারী/গিরিধারী

আন্তঃ সীমান্ত নদী গিদারীর স্থানীয় নাম গিরিধারী। লালমনিরহাট জেলার এই নদীটির উৎপত্তি ঘটেছে ভারতের কোচবিহার জেলায়। নদীটির উজানের অংশ খুঁটামারা এবং ভাটির অংশ গিদারী নামে পরিচিত। নদীটি ভারতের কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ও দিনহাটা মহকুমার সিতাই থানার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী গতিপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। লালমনিরহাট জেলাধীন আদিতমারি উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়ন এলাকার দুর্গাপুর নামক গ্রামের (ওয়ার্ড নং-১) মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তের প্রথম জনপদ অতিক্রম করেছে। এরপর দক্ষিণ-পূর্বমুখী প্রবাহপথ ধরে লালমনিরহাট সদর উপজেলার মোঘলহাট ইউনিয়ন এলাকায় এসে ধরলা নদীতে পতিত হয়েছে। গিদারীর কোন শাখা বা উপনদী বাংলাদেশে নেই। ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল ব্যতীত বছরের অন্যান্য সময় এই নদীতে পানির প্রবাহ দেখা যায়। ভরা বর্ষায় নদীর দুই কূল উপচিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ পাবিত হয়। কোন কোন স্থানে গিদারীর প্রস্থ ৮৫ মিটার পর্যন্ত দেখা গেছে। তবে গড়ে নদীটির প্রস্থ ৫৮ মিটার। বাংলাদেশে গিদারীর দৈর্ঘ্য ১০ কিলোমিটার। এই নদীর তীরে রয়েছে সাথিয়ার হাট, তমালতলা হাট, শিবগঞ্জ হাট, সোনামুখী হাট ইত্যাদি বাজার-বন্দর।

৪. চাওয়াই

চাওয়াই বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আরেকটি অভিন্ন নদী, যেটি তালিকাবহির্ভূত। চাওয়াই নদী ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তিনগর থানাধীন (সন্ন্যাসীকাটা) বৈকুণ্ঠপুর অভয়ারণ্যের জলাভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করে সোজা দক্ষিণমুখী অবস্থায় ভক্তিনগর ও রাজগঞ্জ থানা এলাকা অতিক্রম করেছে। রাজগঞ্জ থানা এলাকা ত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে পঞ্চগড় জেলার সীমানায়। বাংলাদেশে প্রবেশের পূর্বে ভারতের অংশে নদীর ওপর প্রায় ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি লোহার সেতু অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশের মুখে নদীর পূর্ব পারে ভারতের শেষ গ্রাম চাউলহাটি। এখানেই নদীর পূর্বতীর ঘেঁষে ভারতের সীমান্তরক্ষী (বিএসএফ) ক্যাম্পের একটি টাওয়ার রয়েছে। চাওয়াই নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভারতের শেষ গ্রাম ঘোষপাড়া। চাওয়াই বাংলাদেশে প্রবেশের পর নদীর পশ্চিম পার দিয়ে বাংলাদেশের শুরু। এখানকার প্রথম গ্রামটির নাম জোত হাসনাডাঙ্গাপাড়া। নদীর পূর্ব দিকের অংশে ভারতের গ্রামের নাম চাউলহাটি ও ফওতিয়াপাড়া। এর পর থেকেই বাংলাদেশের শুরু এবং প্রথম গ্রামটির নাম গোলাবাড়ি। গোলাবাড়ির পর পাকা রাস্তা শুরু হয়েছে। পাকা রাস্তার পাশে অমরখানা বিজিবি ক্যাম্প এবং অমরখানা পাকা সেতু। সীমান্ত থেকে নদীর পশ্চিম পাশের গ্রামগুলো হল যথাক্রমে জোত হাসনাডাঙ্গাপাড়া, বিড়াজোত ও চ্যাকরমারী। ভারতীয় সীমান্তে উল্লিখিত লোহার ব্রিজ থেকে পঞ্চগড়/তেঁতুলিয়া মহাসড়কের ওপর নির্মিত পাকা সেতু পর্যন্ত চাওয়াই উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী প্রবাহপথ ধরে প্রায় ৪ কিলোমিটার অতিক্রম করেছে। উক্ত লোহার ব্রিজ থেকে নদীর পশ্চিম পারে বাংলাদেশের গ্রাম জোতহাসনার প্রায় দেড় কিলোমিটার অংশে কোন জনবসতি নেই। এখানে রয়েছে কাজী অ্যান্ড কাজী কোম্পানির চা বাগান। এর পরের গ্রাম বিড়াজোত। এখানেও নদীর তীর দিয়ে একই কোম্পানির চা বাগান রয়েছে। ভারতের শেষ গ্রাম চাউলহাটি ব্রিটিশ সময়ে চাওয়াই নদীর তীরবর্তী একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। নদীর পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির সাথে উন্নত সড়ক যোগাযোগ রয়েছে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় অমরখানা বা চাওয়াই ব্রিজের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বিজয় এবং মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা একটি অমর বীরত্বগাথা। ইতিহাসখ্যাত চাওয়াই ব্রিজ অতিক্রম করে চাওয়াই নদী প্রধানত দক্ষিণমুখী প্রবাহপথ ধরে আরও প্রায় ২৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ধাক্কামারা ইউনিয়নের অন্তর্গত লাটুয়াপাড়া নামক গ্রামে এসে করতোয়া নদীতে পতিত হয়েছে। চাওয়াই ব্রিজের পর থেকে মোহনা অবধি নদীর পূর্ব পারের গ্রামগুলো হল যথাক্রমে অমরখানা ডাঙ্গাপাড়া, রোডবাজার, বোয়ালীমারি, চৈতন্যপাড়া, ঠুঠাপাকুড়ী, উত্তর গোয়ালপাড়া, জগদল বাজার, দক্ষিণ গোয়ালপাড়া, মৌলভীপাড়া, শালটিয়াপাড়া, কেচরাপাড়া, কাজীপাড়া ও লাটুয়াপাড়া। নদীর পশ্চিম পারের গ্রামগুলো হল চ্যাকরমারী, খৈপাড়া, পখীলাগা, খালপাড়া, মাঝিপাড়া। চাওয়াই নদীর পশ্চিম পারের উল্লিখিত গ্রামসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠী বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা (জামালপুর, টাঙ্গাইল), সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলা থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করে। প্রথমাবস্থায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে নবাগতদের সুসম্পর্ক ছিল না। পরবর্তীকালে বিবাহাদিসহ অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নানা সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে পূর্বের দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে। চাওয়াই নদীর পশ্চিম পারের সব কয়টি গ্রাম সাতমারা ইউনিয়নের অধীনে।

চাওয়াই পঞ্চগড় সদর উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের লাটুয়াপাড়া গ্রামে এসে করতোয়ায় মিশেছে। করতোয়া ও চাওয়াই নদীসঙ্গমের মাঝের অংশটি (দোয়াব) রাজপাটেরডাঙ্গা নামে পরিচিত। এখানে একটি গুচ্ছগ্রাম গড়ে উঠেছে। এই নদীসঙ্গমটি পঞ্চগড় স্বাস্থ্য বিভাগের লাশকাটা ঘর থেকে সোজা পশ্চিমে ৩০০ গজ দূরে অবস্থিত। নদীসঙ্গমের পশ্চিম পাশের গ্রামের নাম মাঝিপাড়া। পঞ্চগড় পৌরসভার শেষ প্রান্ত থেকে নদীসঙ্গমটি ২ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

চাওয়াই নদীর পানি অত্যন্ত নির্মল। এই নদী নানা দিক থেকে

সমৃদ্ধ। এখানকার বালু নির্মাণকাজের জন্য অত্যন্ত আদর্শ স্থানীয়। এই নদীতে প্রচুর পাথর পাওয়া যেত। নদীর বালু কাচ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চাওয়াই নদীর মাছ বিখ্যাত। উটটা নামের বিশেষ প্রজাতির মাছ এই নদীতে পাওয়া যায়, যেটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। উটের পিঠের আকারবিশিষ্ট এই মাছ ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে।

৫. বেরং

বাংলাদেশের নদী। পঞ্চগড় জেলাধীন তেঁতুলিয়া উপজেলার শালবাহান ইউনিয়ন এলাকার নিম্নাঞ্চল (বিল) থেকে উৎপন্ন হয়েছে বেরং নামের ক্ষুদ্র নদীটি। অনুমান ৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথ ধরে প্রবাহিত হওয়ার পর ভারতের উত্তর দিনাজপুর জেলাধীন ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্গত চোপড়া থানা এলাকায় প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী প্রবাহপথ ধরে এগিয়ে গেছে বেরং। চোপড়া থানা শহরের সামান্য দক্ষিণ-পূর্ব পাশে আসার পর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বয়ে আসা ডাহুক নদের সাথে মিলিত হয়েছে বেরং। এই নদীটির কোন শাখা নেই। গোবরা নামের একটি ক্ষুদ্র নদী বেরং এর একমাত্র উপনদী। গোবরা নদী তেঁতুলিয়া উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পথে এগিয়ে গেছে অনুমান ৩ কিলোমিটার। এরপর বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে আরও ২ কিলোমিটার অগ্রসর হওয়ার পর বেরং নদীতে পতিত হয়েছে।

বেরং নদীর প্রস্থ গড়ে ৫০ মিটার। বেরং নদীতে সারা বছর পানি থাকে। তবে মার্চ মাসে নদী প্রায় শুকিয়ে আসে। এই নদীর ওপর এলজিইডি একটি স্পিলওয়ে নির্মাণ করেছে। বেরং নদীর তীরবর্তী হাট-বাজারের মধ্যে সোনামুখী হাট, ভানুডাঙ্গা হাট ও পাঙ্গাশি হাট উল্লেখযোগ্য।

৬. ভেরসা

বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়ে ভারতে পতিত হওয়া অল্পসংখ্যক অভিন্ন নদীর মধ্যে ভেরসা অন্যতম। ভেরসা নদীর উৎপত্তিস্থল পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলাধীন ভজনপুর ও বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের নিম্ন জলাভূমি থেকে। এই এলাকায় এমন অনেক নিম্ন জলাভূমি রয়েছে, যেখান থেকে সারা বছর ভূগর্ভস্থ পানি (ফল্গুধারা) ওপরে উঠতে থাকে। স্থানীয়ভাবে এগুলো কান্দর নামে পরিচিত। শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ কমে আসে। ভেরসা সারা বছর কমবেশি স্রোতস্বিনী। তবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর স্রোত বেড়ে যায়। ভরা বর্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে ভেরসার উভয় কূল পাবিত হয়। বর্ষার পানিতে সমৃদ্ধ হয়ে যেহেতু পূর্ণাঙ্গ একটি নদীর রূপ ধারণ করে, সে কারণে এই নদীটির নামকরণ হয়েছে বরষা। তবে স্থানীয় উচ্চারণের ফলে বরষা ভেরসায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই নদীর উৎসস্থল নিম্ন জলাভূমিগুলোর অবস্থান ভূতিপুকুর, বোগলাহাগি, প্রধানগজ, লালগজ, হারাদীঘি–এসব এলাকায়। এই এলাকা থেকে ভেরসা নদীর রূপ ধারণ করেছে। ভূতিপুকুর গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে ভেরসা প্রথমাবস্থায় প্রবাহিত হয়েছে। এরপর প্রায় ফাঁকা শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে নয় থেকে দশ কিলোমিটার পথ আঁকাবাঁকা পথে প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে এগিয়ে পঞ্চগড়/তেঁতুলিয়া মহাসড়ক অতিক্রম করেছে একটি মাঝারি আকারের পাকা সেতুর (৫০ মিটার দীর্ঘ) নিচ দিয়ে। ভজনপুর বাজার থেকে এই ব্রিজটি সোজা পশ্চিমে দুই কিলোমিটার দূরে। ভেরসা উক্ত ব্রিজ অতিক্রম করে সোজা দক্ষিণমুখী প্রবাহপথে প্রায় দেড় কিলোমিটার ফসলি জমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণপাড়া নামক গ্রামে পৌঁছে গেছে। এখানে একটি উঁচু বাঁধ (রাস্তাসহ) এবং নদীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সুইস গেট (৬ ভেন্টযুক্ত) রয়েছে। সুইস গেটটি নির্মিত হয়েছে ২০.০৬.২০০২ খ্রিস্টাব্দে। সুইস গেটের পূর্ব পারের গ্রাম ব্রাহ্মণপাড়া, ইউনিয়ন ভজনপুর এবং পশ্চিম পারের গ্রাম মণ্ডলপাড়া, যেটি বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের অধীন, উভয় থানা তেঁতুলিয়া। সুইস গেটটি বছরের প্রায় বারো মাস উন্মুক্ত থাকে। সুইস গেট থেকে ভেরসা আরও প্রায় আধা কিলোমিটার পথ দক্ষিণমুখী অবস্থায় প্রবাহিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। ভেরসা ভারতের তৎকালীন পূর্ণিয়া জেলা অধুনা পশ্চিম বাংলাধীন উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া নামক থানা এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ডাহুক নদে মিলিত হয়েছে। এ অবস্থায় ভারতের অভ্যন্তরের সীমান্ত গ্রাম হল ভেরসার পূর্ব পাশে চোপড়ামারী এবং পশ্চিম পাশে বালাবাড়ি। ২১.০৪.২০১৭ খ্রিস্টাব্দে দেখা গেছে, উক্ত সুইস গেটের সন্নিহিত ভেরসা নদীর প্রশস্ততা ছিল ৩০ মিটার এবং গভীরতা গড়ে ৪ ফুট। কোন কোন স্থানের গভীরতা ৬ ফুট পর্যন্ত দেখা গেছে। ভরা বর্ষায় প্রায় প্রতিবছর ভেরসা নদীর দুই কূল উপচিয়ে আশপাশে পাবিত হয়ে যায়। ভেরসার পানি সুমিষ্ট ও টলটলে। এই নদীতে নানা জাতের মাছ প্রচুর জন্মে। এক মণ ওজনবিশিষ্ট বোয়াল মাছ এই নদীতে পাওয়া যেত। এখন মাছের সংখ্যা কমে এসেছে। উৎসস্থল থেকে অর্থাৎ ভুতিপুকুর এলাকা থেকে ভারতের সীমানা পর্যন্ত এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ কিলোমিটার। নদীর প্রশস্ততা সর্বোচ্চ ৩০ মিটার এবং গড় প্রশস্ততা ২০ মিটার। নদীটি সর্পিলাকার। উৎস থেকে শেষ পর্যন্ত (ভারত সীমান্ত) নদীর দুই পারের গ্রামগুলো হল প্রধানগজ, কুড়ানগজ, গীতাগজ, কারুগজ, বৈরাগীগজ, দিমাগজ, চান্দিয়াগজ, মালিগজ, ব্রাহ্মণপাড়া, বানিয়াপাড়া ও মণ্ডলপাড়া।

পঞ্চগড় জেলায় বিশেষ করে তেঁতুলিয়া ও পঞ্চগড় সদর উপজেলায় এমন অসংখ্য গ্রাম রয়েছে, যেগুলোর নামের শেষে গজ নামক শব্দ সংযোজিত হয়েছে। এই নামকরণের পেছনে ঐতিহাসিক কারণ রয়ে গেছে। গজ হল সংস্কৃত ভাষার শব্দ। অর্থ হচ্ছে হাতি। পঞ্চগড় জেলার এই অংশে পূর্বে জমিদার, ভূস্বামী বা সামন্তগণ হাতি পুষতেন। তাঁরা মাঝেমধ্যে হাতি ছেড়ে দিতেন। হাতি নিজস্ব খেয়ালখুশিমতো ঘুরে যেখানে এসে থেমে যেত, সেটুকু স্থানের নামকরণ করা হতো নতুন করে এবং নামের শেষে গজ সংযুক্ত হত; যেমন–শেখগজ, মালিগজ, লালটুগজ, বকসীগজ ইত্যাদি।

৭. মালদাহা

আন্তঃ সীমান্ত নদী মালদাহা। এটি উৎপত্তি লাভ করেছে ভারতের কোচবিহার জেলায়। কোচবিহার জেলার সিতাই নামক থানা এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিখ্যাত সিতাই বিলের দক্ষিণ পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বমুখী পথে এগিয়ে গেছে। সিতাই থানার সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের প্রথম জনপদ লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন চন্দ্রপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত চন্দ্রপুর গ্রাম। চন্দ্রপুর বাজার অতিক্রম করে প্রথমে দক্ষিণমুখী, এরপর দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথে অগ্রসর হয়ে গোড়ল ইউনিয়নের ঘুংগাগাছ গ্রামে প্রবেশ করেছে। এরপর সেবকদাস, মালগাড়া, দুলালী–এসব গ্রামের মধ্য দিয়ে মালদাহা নদীর প্রবাহপথ। কালীগঞ্জ উপজেলা এলাকা অতিক্রম করে আদিতমারী উপজেলাধীন ভেলাবাড়ি ইউনিয়নের তালুক দুলালী গ্রামে প্রবেশ করেছে। এরপর ভেলাবাড়ি ইউনিয়ন ত্যাগ করে দুর্গাপুর ইউনিয়ন এলাকায় প্রবেশ

করেছে। দুর্গাপুর ইউনিয়ন এলাকা অতিক্রম করে মালদাহা লালমনিরহাট সদর উপজেলাধীন মোঘলহাট ইউনিয়ন এলাকায় প্রবেশ করেছে। এখানে মালদাহা থেকে রতনাই নামে একটি শাখানদীর জন্ম হয়েছে। মালদাহা পূর্বমুখী পথে সামান্য কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে ধরলা নদীতে পতিত হয়েছে। মালদাহা নদীর দৈর্ঘ্য বাংলাদেশে মোট ৩৬ কিলোমিটার। এই নদীটি গড়ে ১৮ মিটার প্রশস্ত। প্রবাহপথে রয়েছে কালীগঞ্জ, আদিতমারী ও লালমনিরহাট সদর উপজেলা এলাকা। মালদাহা নদীর তীরবর্তী হাট-বাজারের মধ্যে চন্দ্রপুর বাজার, বালাইয়ের হাট, লোহাকুচি ও দুরাকুটি বাজার উল্লেখযোগ্য। লোহাকুচি বাজারে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের পাট ও তামাকের ব্যবসা জমজমাট ছিল। এখানে একসময় কাস্টমস বিভাগের একটি অফিস ছিল। মালদাহা নদীতে সারা বছর পানি থাকে। মালদাহার শাখানদী রতনাই ২৪ কিলোমিটার লম্বা। এটিও ধরলা নদীতে গিয়ে মিশেছে। মালদাহার মতই রতনাই নদীতে শুধুমাত্র বর্ষাকালে নৌচলাচল হয়ে থাকে।

৮. লোনা/নোনা

লোনা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আরেকটি তালিকাবহির্ভূত আন্তঃ সীমান্ত নদী। নদীটির উৎসমুখ বাংলাদেশে এবং পতিতমুখ ভারতের অভ্যন্তরে। ঠাকুরগাঁও জেলাধীন রানীশংকৈল উপজেলার ধর্মগড় ইউনিয়নের ঝিল অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়েছে দুটি ক্ষুদ্র নদীর ধারা। দক্ষিণমুখী গতিপথ ধরে এগিয়ে গিয়ে একপর্যায়ে দুটি ধারা হরিপুর উপজেলাধীন আমগাঁও ইউনিয়ন এলাকায় এসে একত্রিত হয়েছে। সম্মিলিত ধারাটি লোনা নামে দক্ষিণমুখী গতিপথে এগিয়েছে। ২নং বাকুয়া ইউনিয়ন ও ৪নং ডাঙ্গিপাড়া ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ৫নং হরিপুর ইউনিয়ন এলাকায় প্রবেশ করেছে। একপর্যায়ে আরও দক্ষিণে হরিপুর ইউনিয়ন এলাকার শেষ সীমান্তগ্রাম দোনগাঁও অতিক্রম করে ভারতের উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানা এলাকায় প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী প্রবাহপথ ধরে এগিয়ে গেছে। এই অঞ্চলে নদীটি নোনা নামে পরিচিত। রায়গঞ্জ থানাধীন ভাতোল নামক ছোট শহর অতিক্রম করার পর নোনা আরও কিছুটা পথ দক্ষিণ-পশ্চিমে রায়গঞ্জ ও করণদীঘি থানার মাঝামাঝি অঞ্চলে এসে নাগর নদে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশ অংশে লোনা নদীটির দৈর্ঘ্য ৩০ কিলোমিটার। লোনা সর্পিলাকারে প্রবাহিত। বাংলাদেশ অংশে লোনার কোন শাখা বা উপনদী নেই। লোনা নদী বছরের প্রায় ৩ থেকে ৪ মাস শুষ্ক থাকে। বছরের অন্য মাসগুলোতে নদীতে পানি থাকে। আমগাঁও ইউনিয়ন এলাকায় লোনা নদীর তীরে জাদুরানীহাট নামে প্রাচীন নৌবন্দর রয়েছে। এ ছাড়াও বকুয়া ইউনিয়ন এলাকায় রয়েছে নদীতীরবর্তী বীরগঞ্জ হাট। এসব হাটে মূলত ধান-চালের আমদানি হত প্রচুর। লোনা যখন সারা বছর নাব্য ছিল সে সময় নদীবন্দরগুলো ছিল বেশ সমৃদ্ধ। বর্তমানে এই গঞ্জ বা বন্দরগুলোর পূর্বের জৌলুস আর নেই। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই নদীর ওপর একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যেটি রহমতপুর প্রকল্প নামে পরিচিত।

৯. সিমলাজান/সেমিয়াজান/সানিয়াজান

সিমলাজান বা সানিয়াজান নামক নদ ভারতে সেমিয়াজান নামে পরিচিত। এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি অনুল্লিখিত আন্তঃ সীমান্ত নদ। তিস্তা ও ধরলা নদীর মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে সিমলাজান প্রবাহিত। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা থেকে উৎপত্তি লাভ করে একই জেলাধীন ময়নাগুড়ি থানা এলাকা অতিক্রম করে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানা এলাকায় প্রবেশ করেছে। মেখলিগঞ্জ থানার দক্ষিণ-পূর্বে শেষ জনপদ উপনচুকি কুচলীবাড়ি নামক সীমান্তগ্রামটি অতিক্রম করে সেমিয়াজান বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রথম গ্রামটির নাম পানবাড়ি। এখানকার ইউনিয়নের নাম কুচলীবাড়ি, থানা পাটগ্রাম, জেলা লালমনিরহাট। বাংলাদেশে প্রবেশের পর এর নাম সিমলাজান। স্থানীয় মানুষদের কাছে সানিয়াজান নামেও পরিচিত। সিমলাজান কুচলীবাড়ি, বাউরা, বড়খাতা ও গড্ডিমারি ইউনিয়নগুলোর বিভিন্ন গ্রাম অতিক্রম করে তিস্তা নদীতে পতিত হয়েছে। সিংগিমারী নামক নদী সিমলাজানের একমাত্র উপনদী। এটি পাটগ্রাম উপজেলার বারুয়া ইউনিয়ন এলাকায় এসে সিমলাজানে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে সিমলাজানের সর্বমোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৪ কিলোমিটার। বছরের প্রায় ৮ মাস পানিপ্রবাহ দেখা যায়। অবশিষ্ট শুষ্ক মৌসুমের ৪ মাস নদীর বিভিন্ন স্থানে পানিপ্রবাহ প্রায় থাকে না। বাউরা ইউনিয়নের অন্তর্গত বাউরা নামক প্রাচীন নৌবন্দরটি সিমলাজান নদের তীরে অবস্থিত। এখানে ছিল পাট, তামাক ও ধানের বড় কারবার। বড় আকারের মালবাহী নৌকা ব্যবহৃত হত মালামাল পরিবহনে। নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বহু বছর পূর্ব থেকেই এই বন্দরটি জৌলুস হারিয়ে ফেলেছে।

১০. সিংগিমারী

সিংগিমারী নদী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি আন্তঃ সীমান্ত নদী। ভারতের কোচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য) জেলাধীন শীতলকুচি থানা এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় প্রবেশ করেছে। শীতলকুচি থানাধীন নগর সিংগিমারী ও গাছতলা গ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারতের সীমানা ত্যাগ করেছে। এরপর বাংলাদেশে লালমনিরহাট জেলাধীন হাতীবান্ধা উপজেলার অন্তর্গত সিংগিমারী ইউনিয়নের সিংগিমারী গ্রামে প্রবেশ করেছে। সিংগিমারী থেকে বাড়াইপাড়া, গেন্দুকুড়ি, গোতামারী, আমঝোল হয়ে কালীগঞ্জ উপজেলার গোড়ল ইউনিয়ন এলাকা অতিক্রম করে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। স্থানীয়ভাবে সিংগিমারী 'খর্প' নদী নামে পরিচিত। এই নদীর তীরের গ্রাম সিংগিমারী ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ছিল পুরনো একটি নদীবন্দর। এই নদীর তীরে একাধিক ছিটমহল রয়েছে, যার মধ্যে উত্তর গোতামারী ও আমঝোল অন্যতম। খরা মৌসুমের ৩-৪ মাস ব্যতীত বছরের অন্যান্য সময় এই নদীতে পানি থাকে। নদীর কিছু কিছু অংশে নৌকা চলাচল করতে দেখা য়ায়। সিংগিমারীর দৈর্ঘ্য বাংলাদেশে প্রায় ২১ কিলোমিটার।

১১. যমুনা (পঞ্চগড়)

যমুনা (পঞ্চগড়) আরেকটি তালিকাবহির্ভূত অভিন্ন নদী। ভারতের পশ্চিম বাংলার জলপাইগুড়ি জেলাধীন ভক্তিনগর থানায় উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী প্রবাহপথ ধরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছে গেছে। জলপাইগুড়ি সদর থানাধীন ভারতীয় সীমান্তের শেষ গ্রাম নদীর পূর্ব পারে নতুন সর্দারপাড়া এবং পশ্চিম পারের ঝাকুয়াপাড়া নামক গ্রাম দুটি অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ অবস্থায় যমুনার পূর্ব পাশে বাংলাদেশের প্রথম গ্রাম সিংরোড প্রধানপাড়া এবং যমুনার পশ্চিম পারে বাংলাদেশের প্রথম গ্রামের নাম পেট্টুপাড়া–উভয় ইউনিয়ন চাকলাহাট, থানা ও জেলা পঞ্চগড়। যমুনা বাংলাদেশে প্রবেশ করে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী প্রবাহপথে প্রায় ২ কিলোমিটার অগ্রসর হওয়ার পর কহরুহাট নামক একটি বাজার পশ্চিম পাশে রেখে অগ্রসর

হয়েছে। এ অবস্থায় ৭০ মিটার দীর্ঘ একটি পাকা ব্রিজ অতিক্রম করে যমুনা সোজা দক্ষিণমুখী অবস্থায় প্রায় ৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে পৌঁছে গেছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের শেষ গ্রাম নারায়ণপুর দেউনিয়াপাড়া অতিক্রম করে যমুনা ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার মানিকগঞ্জ থানাধীন ভুজারীপাড়া নামক গ্রামে প্রবেশ করেছে। যমুনা এরপর উক্ত মানিকগঞ্জ থানার খৈয়েরবাড়ি নামক স্থানে পৌঁছলে পশ্চিম দিক থেকে আসা কুরুম নদের সাথে একত্রিত হয়ে যমুনা নামে আরও প্রায় ৩ কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলাধীন বোদা উপজেলার বড়শশী ইউনিয়নের অন্তর্গত নাউতারি সরকারপাড়া নামক গ্রামে প্রবেশ করেছে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী প্রবাহপথে। এভাবে একই গ্রামের মধ্য দিয়ে তিন শ গজ চলার পর পূর্বমুখী হয়ে অনুমান আধা কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে। এ অবস্থায় উত্তর দিক থেকে আসা পাঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হয়ে ঘোড়ামারা নাম ধারণ করেছে। যমুনা/পাঙ্গা নদীসঙ্গমের দক্ষিণ পাশে নাউতারি সরকারপাড়া এবং পূর্ব পাশে শামেরডাঙ্গা নামক গ্রাম। উভয় বড়শশী ইউনিয়ন, থানা বোদা, জেলা পঞ্চগড়। যমুনা/পাঙ্গার মাঝের দোয়াব অঞ্চলটি ভারতের মানিকগঞ্জ থানা, জেলা জলপাইগুড়ির অধীনে বুড়ীরজোত নামক গ্রাম। বাংলাদেশে যমুনার সর্বমোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ কিলোমিটার। সারা বছর এই নদীতে কমবেশি পানিপ্রবাহ থাকে। এই নদীর গড় প্রস্থ ৪৫ মিটার। বর্ষাকালে সর্বোচ্চ ৮০ মিটার প্রশস্ততা লক্ষ করা গেছে। শুষ্ক মৌসুমে ২২.০৪.২০১৭ তারিখে এই নদীর প্রশস্ততা ছিল ৩০ মিটার।

১২. ফুলকুমার

ফুলকুমার নদ ভারতের কোচবিহার জেলাধীন তুফানগঞ্জ মহকুমার তুফানগঞ্জ থানা এলাকা দিয়ে প্রবাহিত কালজানী নামক নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এরপর তুফানগঞ্জ এলাকা অতিক্রম করে দিনহাটা-২ বকের উত্তর-পূর্ব অংশ দিয়ে সর্পিলাকারে প্রবাহিত হয়েছে। উক্ত বকের সীমান্ত জনপদ দীঘলটারি ও কুমারগঞ্জ গ্রাম দুটির মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলাধীন ভূরুঙ্গামারী উপজেলা এলাকায় প্রবেশ করেছে। ব্রিটিশ সময়ে কোচবিহারের প্রভাবশালী জমিদারের আওতাধীন ছিল বর্তমানের ভূরুঙ্গামারী উপজেলা। ফুলকুমার নদটি ভারতের সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সীমান্তগ্রাম পাথরডুবি নামক জনপদে (ওয়ার্ড নং-৭) প্রবেশ করেছে। এরপর পশ্চিম মইগ্রাম পেরিয়ে ফুলকুমার নামক গ্রামে প্রবেশ করেছে। জমিদারপুত্রের নাম ফুলকুমার। একই সাথে গ্রাম ও নদীর নামকরণ হল ফুলকুমার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন পাথরডুবি, ভূরুঙ্গামারী সদর, জয়মনিরহাট এবং আন্ধারীঝাড় ইউনিয়নগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফুলকুমার নাগেশ্বরী উপজেলায় প্রবেশ করেছে। নাগেশ্বরীর রায়গঞ্জ বাজারের নিকট এসে কুড়িগ্রাম/ভূরুঙ্গামারী সড়কে ফুলকুমারের ওপর নির্মিত পাকা সেতু (৩০ মিটার দীর্ঘ) অতিক্রম করেছে এবং সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ দক্ষিণ-পূর্বমুখী অবস্থায় প্রবাহিত হয়ে রায়গঞ্জ উপজেলাধীন দামালগ্রাম ঘাটে এসে দুধকুমার নদে পতিত হয়েছে। এখানে ফুলকুমার নদের ওপর একটি সুইস গেট রয়েছে। দুধকুমার নদের পূর্ব পারে সুবলপাড় ঘাট এবং বাজার। ইউনিয়ন-কেদার, থানা-কচাকাটা। বাংলাদেশে ফুলকুমার নদটি ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। এর গড় প্রশস্ততা ৫৫ মিটার। ফুলকুমারের তীরবর্তী রায়গঞ্জ বাজার একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র।

১৩. গুকসী/ঘুকসী/ইছামতি (দিনাজপুর)

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার গুকসী বা ঘুকসীর বিল এবং ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাধীন কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান সময়ের ঘুকসীর খাল (Ghukshir Khal) আসলে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার প্রাচীনকালের ইছামতি নদীর ভাটির অংশ। প্রাচীনকালে ইছামতি (দিনাজপুর) নদী উৎপত্তি লাভ করেছিল করতোয়া নদী থেকে। উৎপত্তিস্থল ছিল বর্তমান সময়ের নীলফামারী এবং খানসামা উপজেলার সীমান্তবর্তী স্থান দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রাচীন করতোয়া। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঘটে যাওয়া তিস্তার মহাপাবনে করতোয়ার গতিপথ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ইছামতির উৎসস্থলটিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে ইছামতির উৎপত্তিস্থল খানসামা উপজেলার আঙ্গরপাড়া ইউনিয়নের ছাতিয়াননগর বিল। এখান থেকে উৎপত্তি লাভ করে ইছামতি দক্ষিণমুখী প্রবাহপথে সৈয়দপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক অতিক্রম করেছে। এ অবস্থায় চিরিরবন্দর উপজেলাধীন রানীরবন্দর নামক একটি বৃহৎ বন্দর বাজারকে পশ্চিম দিকে রেখে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে গেছে। রানীরবন্দরে এই নদীর নামে ইছামতি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর ইছামতি পূর্ব দিকে ছোট যমুনা এবং পশ্চিম দিকে আত্রাইয়ের মাঝামাঝি পথে দক্ষিণমুখী অবস্থায় ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানায় প্রবেশ করেছে। কুমারগঞ্জ এবং বালুরঘাট থানা এলাকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণমুখী পথে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর নওগাঁ জেলাধীন ধামইরহাট উপজেলার ওমর ইউনিয়নের চকসবদল নামক গ্রামে প্রবেশ করেছে। ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানা এলাকায় ইছামতির নাম পরিবর্তিত হয়ে ঘুকসীর খাল নামকরণ হয়েছে। হয়ত দীর্ঘকাল পলি জমে ইছামতির প্রবাহপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার এক পর্যায়ে খনন করা হয়েছিল। তখন থেকেই মানুষের মুখে মুখে প্রাচীন এই নদীটি খাল হিসেবে নতুন পরিচয় বহন করে চলেছে। ঘুকসীর প্রবাহপথে ভারতের শেষ গ্রাম বালুরঘাট থানাধীন কামারপাড়া ভূলকীপুর। বাংলাদেশের প্রথম গ্রাম চকসবদল। চকসবদল গ্রামসংলগ্ন ইতিহাসখ্যাত আলতাদীঘি। চকসবদল থেকে ঘুকসী বা ইছামতি সামান্য দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়েছে এবং আলতাদীঘিকে পূর্ব পারে রেখে প্রথমে দাদনপুর, এরপর চকশিবপুর, মইশর, জগদল–এসব গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর ঘুকসী জয়পুরহাট/ধামইরহাট পাকা রাস্তার ওপর নির্মিত প্রায় ৫০ মিটার দীর্ঘ একটি পাকা ব্রিজের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সোজা দক্ষিণে আরও প্রায় ২০ কিলোমিটার আসার পর পত্নীতলা উপজেলার আমইর ইউনিয়ন এলাকায় এসে ছোট যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে।

বাংলাদেশ অংশে এটি ঘুকসী বিল নামে পরিচিতি পেলেও আসলে এটি ইছামতি নদীর ভাটির অংশ। এই নদীর পূর্ব তীরে ইতিহাসখ্যাত জগদ্দল মহাবিহার এবং পশ্চিম তীরে ধামইরহাট পৌর শহর অবস্থিত। এ ছাড়াও প্রাচীন প্রত্নস্থল আমইর (পালরাজা রামপাল কর্তৃক নির্মিত রাজধানী শহর রামাবতী) এবং যোগীরঘোপা ও যোগীগোফা ইছামতি বা ঘুকসীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে মোগল সুবাদার ইসলাম খান ভাটি বাংলা অভিযানে এসে এই নদীর পূর্ব পারে অবস্থিত শাহপুর নামক মোগলদের নির্মিত দুর্গে প্রায় ১৫ দিন অবস্থান করেছিলেন। ৩০ মে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি শাহপুর ত্যাগ করে ঘোড়াঘাটের উদ্দেশে রওনা হন।

বাংলাদেশে এই নদীর দৈর্ঘ্য ৩৬ কিলোমিটার। এর সর্বোচ্চ

প্রশস্ততা ১৮ মিটার। বর্ষাকালে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। পূর্বের তুলনায় পানিপ্রবাহ আরও কমে এসেছে, কারণ ভারত এই নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ করে পানি নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৪. চিরি/শ্রী নদী

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলাধীন কাতলা ইউনিয়নের অন্তর্গত জোতমাধব বিল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে চিরি বা শ্রী নদী। প্রথমাবস্থায় বিরামপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে ২ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম বাংলার (ভারত) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাধীন হিলি থানার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই থানার মধ্য দিয়ে দক্ষিণমুখী প্রবাহপথ ধরে অনুমান ৮ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পুনরায় বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলায় প্রবেশ করেছে। জয়পুরহাট জেলার মধ্য দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন ধামইরহাট ইউনিয়ন এলাকায় প্রবেশ করেছে। ধামইরহাট উপজেলার বিখ্যাত প্রত্নস্থল জগদ্দল মহাবিহারকে পশ্চিমে রেখে দক্ষিণ-পূর্বমুখী প্রবাহপথ ধরে পুরাতন বাঁধের পাশ দিয়ে আরও কিছুটা দক্ষিণে এসেছে।

এরপর চিরি নদী বিখ্যাত মঙ্গলবাড়ী স্তম্ভকে পূর্ব দিকে রেখে জাহানপুর ইউনিয়ন এলাকা অতিক্রম করে ধামইরহাট উপজেলাধীন ইসবপুর ইউনিয়ন এলাকায় এসে ছোট যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে এই নদীর দৈর্ঘ্য ৩৮ কিলোমিটার। এই নদীর গড় প্রশস্ততা ৪০ মিটার। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কোন প্রবাহ থাকে না। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভরা বর্ষায় নদীতে প্রবাহ থাকে। বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদীর তালিকা থেকে বাদ পড়া চিরি বা শ্রী নদীর ভারতের অংশে বাঁধ দিয়ে এর পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের ভাটির অংশে পানিপ্রবাহ কমে এসেছে।

১৫. আলাইকুমারী

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আরেকটি তালিকাবহির্ভূত অভিন্ন নদী আলাইকুমারী। ভারতের পশ্চিম বাংলার কোচবিহার জেলাধীন হলদিবাড়ি থানার নিম্নাঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলাধীন বড়শশী ইউনিয়নের অন্তর্গত সীমান্তগ্রাম অমরখানায় প্রবেশ করেছে। এরপর আলাইকুমারী অমরখানা, বালাপাড়া ও ডাঙ্গাপাড়া–এসব গ্রাম অতিক্রম করেছে সোজা দক্ষিণমুখী প্রবাহপথ ধরে। ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে এসে আলাইকুমারী কুরুণ নদের পশ্চিম পারে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে আলাইকুমারীর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৫ কিলোমিটার। এই নদীটির গড় প্রস্থ ১৫ মিটার। সারা বছর পানিপ্রবাহ থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে প্রায় পানিশূন্য দেখা যায়।

১৬. গঙ্গাধর

গঙ্গাধর নদ জন্মলাভ করেছে উত্তর-পশ্চিম ভুটানের পানাখা বা পুনাখা পর্বতমালা থেকে। এটি মূল হিমালয় পর্বতমালার অংশ। উৎসমুখটি তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ। উক্ত পর্বত থেকে নেমে এসেছে মোচ্যু (Moch̆) নামের একটি উৎস প্রবাহ। মোচ্যু উচ্চ পর্বতমালা থেকে সামান্য ভাটিতে নেমে আসার পর এর নাম পুনাসাংচ্যু। আসলে ভুটানের মধ্যে এটি পুনাসাংচ্যু নামেই পরিচিত। ভুটান সীমান্ত ত্যাগ করে পুনাসাংচ্যু ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমাধীন কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত কালিখোলা নামক গ্রামে প্রবেশ করেছে। এখান থেকে পুনাসাংচ্যু সংকোশ নাম ধারণ করেছে। দক্ষিণমুখী প্রবাহ ধরে এগিয়ে যাওয়ার পথে সংকোশ পশ্চিম বাংলা ও আসামের সীমান্ত রচনা করেছে। জলপাইগুড়ি জেলা ত্যাগ করে সংকোশ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ব্লক-২ এলাকায় প্রবেশ করেছে। এ সময় সংকোশ তুফানগঞ্জ এলাকার মহিষকুচি নামক ছোট শহরের দক্ষিণে পশ্চিম বাংলা সীমান্ত ত্যাগ করে আসামের কোকরাঝাড় জেলায় প্রবেশ করেছে। এখানে রায়ডাক-২ বা ছোট রায়ডাক নদের সাথে সংকোশ মিলিত হয়েছে। সম্মিলিত প্রবাহটি বড় গদাধর বা গঙ্গাধর নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে আসামের ধুবরী জেলায় প্রবেশ করেছে। ধুবরী জেলার গোলকগঞ্জ থানা এলাকার মধ্য দিয়ে গঙ্গাধর সামান্য দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে ভারত সীমান্ত ত্যাগ করে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। ভারতের ধুবরী জেলাধীন গোলকগঞ্জ থানা সদর থেকে গঙ্গাধরের গতিপথ ধরে অনুমান ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। গঙ্গাধরের প্রবাহপথে শেষ ভারতীয় গ্রামের নাম বিন্নাছড়া ও সাতঘরিপাড়া। এরপর বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলাধীন নাগেশ্বরী উপজেলা এবং কচাকাটা নামক থানা (২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত)। গঙ্গাধর বাংলাদেশে প্রবেশের মুখে প্রথম গ্রাম দুটির নাম ধনীরামপুর ও তরীরহাট। এই দুটি গ্রামের মাঝ দিয়ে গঙ্গাধর প্রবাহিত হয়ে বালারহাট ও ইন্দ্রগড় গ্রাম দুটি অতিক্রম করেছে। সামান্য দক্ষিণ-পূর্বমুখী গতিপথ ধরে এগিয়ে এসে মাদারগঞ্জ বাজার (কচাকাটা থানা সদর) থেকে অনুমান ২ কিলোমটার (দক্ষিণ-পূর্ব) দূর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মাঝিপাড়া খেয়াঘাট অতিক্রম করেছে। মাঝিপাড়া খেয়াঘাট গঙ্গাধরের পশ্চিম পারে। গঙ্গাধরের পূর্ব পারে চৌদ্দঘরি বাজার। এখান থেকে গঙ্গাধর আরও প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে এগিয়ে গেছে। এরপর নাগেশ্বরী উপজেলাধীন নুনখাওয়া ইউনিয়নের চরকাঠগিরি নামক গ্রামে এসে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত দুধকুমার নদের সাথে গঙ্গাধর মিলিত হয়েছে। মিলিত স্রোতটি সামান্য কিছুটা পথ প্রবাহিত হওয়ার পর পুনরায় দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। এভাবে উভয় ধারা স্ব স্ব নাম বহন করে আরও প্রায় ৩ কিলোমিটার সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পথে এগিয়ে গেছে। অবশেষে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাধীন যাত্রাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ভগবতীপুর নামক স্থানে এসে গঙ্গাধর ব্রহ্মপুত্রে পতিত হয়েছে। গঙ্গাধরের মোহনার কাছাকাছি আরও কিছুটা ভাটিতে এসে দুধকুমার নদ ব্রহ্মপুত্রে পতিত হয়েছে।

গঙ্গাধর নদটি উৎস থেকে মধ্যপ্রবাহ এবং সব শেষে ভাটি ও মোহনার অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। উৎসমুখ থেকে ভুটানের অংশে নদটি পুনাসাংচ্যু নামে পরিচিত। পাহাড় পেরিয়ে কিছুটা সমতলে ভারতে প্রবেশ করার পর নদটির নাম সংকোশ। ভারতের অংশে নদটির মধ্যপ্রবাহ। এই অংশে সংকোশ নদ সুবর্ণকোষ, গদাধর, গাংঘার এবং সব শেষে গঙ্গাধর নামে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর একমাত্র গঙ্গাধর নাম ধারণ করেই ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরের ৩-৪ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ নাগেশ্বরী উপজেলাধীন নুনখাওয়া নামক বিখ্যাত নদীবন্দরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। সে সময় পর্যন্ত গঙ্গাধরের পতিতমুখ অর্থাৎ মোহনা ছিল নুনখাওয়া বন্দরে। স্বাভাবিক কারণে দুধকুমার (উজানে কালজানী-রায়ডাক-তোরসা) নদীটিও এসে পতিত হত নুনখাওয়া নামক স্থানে এসে ব্রহ্মপুত্র নদে। এই ত্রিমোহনাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত পবিত্র। এখানে বহুকাল পূর্ব থেকেই অশোকাষ্টমীর (চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টম দিনে) ব্রহ্মপুত্রস্নানতর্পণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর একই সময়ে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্ত নুনখাওয়া বন্দরে ব্রহ্মপুত্র তটে সমবেত হন এবং ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র

জলেস্নানতর্পণের মধ্য দিয়ে স্ব স্ব পাপ মোচনে প্রয়াসী হন। ভুটান ও ভারতের অংশে পুনাসাংচ্যু-সংকোষ-গদাধর-গঙ্গাধরের দৈর্ঘ্য ৩০০ কিলোমিটার। বাংলাদেশ অংশে গঙ্গাধরের দৈর্ঘ্য ২০ কিলোমিটার। সংকোশ বা গঙ্গাধরের প্রধান উপনদী রায়ডাক-২ বা ছোট রায়ডাক।

১৭. শিয়ালদহ

ভারতের আসাম রাজ্যের ধুবরী জেলার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র ধুবরী শহরে। শহরটির পাশ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণমুখী পথ ধরে প্রবাহিত হয়েছে। এই শহরে রয়েছে একাধিক ঘাট। ঘাটগুলো ব্রহ্মপুত্রের তীরে গড়ে উঠেছে। ধুবরী শহরের নিউঘাট নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে শিয়ালদহ নামের ক্ষুদ্র একটি নদ। ব্রহ্মপুত্রের ক্ষুদ্র শাখানদীগুলোর মধ্যে শিয়ালদহ অন্যতম। উৎপত্তি লাভের পর প্রথমাবস্থায় শিয়ালদহের গতিপথ পশ্চিমমুখী। কিছুদূর এভাবে প্রবাহিত হওয়ার পর ইতিহাসখ্যাত ভাসানের চরের সামান্য উত্তর পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ভাসানের চর অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্তের কাছে পাঠামারি নামক গ্রামে পৌঁছে যায়। এরপর ভোগডহর নামক গ্রামটি অতিক্রম করে ভারতের শেষ সীমান্ত গ্রাম টাকিমারি পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। টাকিমারি গ্রামটি বর্তমানে আবুলের চর নামে পরিচিত। শিয়ালদহ নদ ভারতের শেষ গ্রাম টাকিমারি বা আবুলের চর অতিক্রম করে বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করেছে ঝাউকুঠি ও বালারহাট নামক গ্রাম দুটির মধ্য দিয়ে। গ্রাম দুটি কুড়িগ্রাম জেলাধীন নাগেশ্বরী উপজেলার অন্তর্গত নারায়ণপুর ইউনিয়নের মধ্যে। পুলিশ প্রশাসন কচাকাটা নামক থানার আওতায় (২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত)। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর শিয়ালদহ সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়েছে। এরপর কন্যামতি ও বালারহাট গ্রাম দুটির মাঝ বরাবর প্রবাহিত হয়ে বলভেরখাস নামক গ্রামের মাঝিপাড়া ঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে গঙ্গাধর নদে পতিত হয়েছে। শিয়ালদহের দৈর্ঘ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৯ কিলোমটার। উৎস থেকে ভারতীয় অংশে শিয়ালদহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে শিয়ালদহ ১৯ কিলোমিটার লম্বা।

শিয়ালদহ নদ ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গাধরের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত। এটি ব্রহ্মপুত্রের শাখা এবং গঙ্গাধরের উপনদী। শিয়ালদহ নদে 'ঘোড়েয়া' নামে পরিচিত এক প্রজাতির অতি সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। কার্পজাতীয় এই মাছ সর্বোচ্চ ১৫ কেজি ওজনের হয়ে থাকে। শিয়ালদহ দিয়ে সারা বছর পানি প্রবাহিত হয়। ১৫.০৩.২০১৫ সালে সরেজমিনে শিয়ালদহ পরিদর্শন করে দেখা গেছে, নদটি ১৫০ মিটার প্রশস্ততা নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। স্রোত রয়েছে তবে গতি তীব্র নয়। এসময় নদটির সর্বোচ্চ গভীরতা লক্ষ করা গেছে দেড় মিটার। তবে নদটির অধিকাংশ স্থান দিয়েই হাঁটু কিংবা কোমর পানি ভেঙে নদী পারাপার চলে। একই দিনে গঙ্গাধর নদ অতিক্রমকালে দেখা গেছে, গঙ্গাধরে স্রোত রয়েছে এবং খেয়ানৌকার সাহায্যে গঙ্গাধর পাড়ি দিতে হয়েছে। এসময় গঙ্গাধরের প্রশস্ততা ছিল ২০০ মিটার। স্থানীয় মানুষজনের মাধ্যমে জানা গেছে, ভরা বর্ষায় শিয়ালদহ দুকূল ছাপিয়ে চওড়ায় আধা কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়। অপরপক্ষে গঙ্গাধর বর্ষাকালে বিস্তৃত হয়ে পৌনে এক কিলোমিটার প্রশস্ততা লাভ করে। গঙ্গাধরের খেয়াঘাট পার হয়ে চৌদ্দঘরি বাজার থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে আসার পর শিয়ালদহ নদ।

১৮. সুই

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে তালিকাভুক্ত ৫৪টি অভিন্ন নদীর অন্যতম ঘোড়ামারা নদী। সুই নামক তালিকাবহির্ভূত অভিন্ন নদীটি উল্লিখিত ঘোড়ামারার একটি উপনদী। সুই নদী উৎপত্তি লাভ করেছে পশ্চিম বাংলার (ভারত) জলপাইগুড়ি জেলাধীন মানিকগঞ্জ থানা এলাকায়। সুই নদী উক্ত থানাধীন ওখরাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের দইখাতা নামক ছিটমহলে প্রবেশ করেছে। প্রথমে দইখাতা, এরপর পাহাড়িয়াপাড়া এবং সুই নামক গ্রাম অতিক্রম করেছে। এভাবে প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর সুইয়েরপার নামক স্থানে এসে ঘোড়ামারা নদীতে পতিত হয়েছে। সুই নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী পথে দইখাতা নামক গ্রামে। এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথে অগ্রসর হয়েছে। সর্পিলাকারে প্রবাহিত হওয়ার সময় সরাসরি পূর্বমূখীও হয়েছে। সব শেষে সোজা পূর্বমুখী পথে ঘোড়ামারায় পতিত হয়েছে। মোহনার উত্তর দিকে পাহাড়িয়াপাড়া ও সুইয়েরপাড় এবং দক্ষিণ দিকে মালকাডাঙ্গা গ্রাম। মালকাডাঙ্গায় বাংলাদেশের বিজিবি ক্যাম্প রয়েছে। বাংলাদেশ অংশে সুই নদীর দৈর্ঘ্য ৪ কিলোমিটার। সুই নদীতে সারা বছর পানি থাকে তবে শুষ্ক মৌসুমে পানির পরিমাণ অতি সামান্য। উভয় দেশের নাগরিকরা নদীতে মাছ ধরে থাকে। মোহনার কাছাকাছি স্থানে নদীর প্রশস্ততা ৫০ গজ লক্ষ করা গেছে। ২৬.০৩.২০১৮ তারিখে সুই নদীর মোহনার উভয় পাশে (উত্তর ও দক্ষিণ) নদীর পার দিয়ে ধানের চাষ হতে দেখা গেছে। নদীর মাঝ দিয়ে সামান্য পানির প্রবাহ ঘোড়ামারায় পতিত হচ্ছিল। দক্ষিণ পারের মালকাডাঙ্গা এবং নদীর উত্তর পারের পাহাড়িয়াপাড়ার সাথে একটি কাঠের সাঁকো দ্বারা সংযোগ করা আছে। সুই নদীর গড় প্রশস্ততা ৩০ গজ।

১৯. সাউ/সাউন/সাহু

সাউ বা সাউন নদী তিস্তার শাখা এবং করতোয়ার উপনদী। এটি বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে একটি তালিকাবহির্ভূত অভিন্ন নদী। স্থানীয়ভাবে নদীটি সাউ নামে পরিচিত। সাহু নামেও অভিহিত হয়। ভারতে এই নদীর নাম সাউন। নদীটি দার্জিলিং জেলার কদমতলা থানা এলাকা দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণমুখী প্রবাহপথে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করেছে। জলপাইগুড়ি জেলাধীন ভক্তিনগর থানায় অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে সোজা দক্ষিণমুখী পথে অগ্রসর হয়েছে। এভাবে প্রায় ১৫ কিলোমিটার আসার পর দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়েছে। আরও ৫ কিলোমিটার চলার পর পুনরায় দক্ষিণমুখী অবস্থায় আঁকাবাঁকা পথে আরও প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে জলপাইগুড়ি জেলাধীন রাজগঞ্জ থানার হুদুগঞ্জ নামক গ্রাম অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের প্রথম গ্রাম ভুতিপুকুর, মৌজা প্রধানগজ, পিলার নাম্বার ৭৩৮ এর ৮ এস ও ৯ এস এর মধ্যবর্তী স্থান। স্থানটি ভুতিপুকুর বিজিবি ক্যাম্প থেকে এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে। সাউ নদী বাংলাদেশে প্রবেশের পূর্বে অনুমান ৪০০ গজ উত্তর দিকে ভারত ভূখণ্ডে নদীর ওপর একটি লোহার সেতু রয়েছে। নদীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ট্যাপারভিটা বিএসএফ ক্যাম্প। ক্যাম্প থেকে ২০০ গজ পশ্চিমে সাউ নদীর অবস্থান। ২০.০৪.২০১৭ তারিখে সাউ নদীর প্রশস্ততা লক্ষ করা গেছে ৩০-৩৫ গজ। পানির গভীরতা পাঁচ থেকে ছয় ফুট। নদীতে স্রোত ছিল। পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ। উক্ত লোহার ব্রিজের নিচ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী অবস্থায় প্রবাহিত হয়ে প্রায় ৪০০ গজ আসার পর বাংলাদেশে প্রবেশ করে পশ্চিমমুখী

হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর পুনরায় দক্ষিণমুখী হয়েছে বোগলাহাটি নামক গ্রামে এসে। এ অবস্থায় নদীর পশ্চিম পারে বাংলাদেশের কীর্তনপাড়া ও মুলখাগঞ্জ। পূর্ব পারে ভারত। সাউ নদী বাংলাদেশের ভুতিপুকুর এলাকায় প্রবেশের পর অনুমান সাত কিলোমিটার উভয় দেশের সীমানা রচনা করে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী প্রবাহপথে এগিয়েছে। এরপর সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। এ অবস্থায় নদীর পশ্চিম পারে কীর্ত্তনপাড়া ও মুলখাগঞ্জ গ্রাম এবং পূর্ব পারে ভদ্রেশ্বর মৌজাধীন কাজী অ্যান্ড কাজী চা বাগান। সাউ এভাবে এক কিলোমিটার পথ দক্ষিণমুখী অবস্থায় চলার পর ঝালিঙ্গী নামক মৌজায় (জেএল নং-২৭) পৌঁছে যায়। সাউ এই স্থানে এসে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা করতোয়া নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। দুই নদীসঙ্গমের মাঝামাঝি দোয়াব অঞ্চলটি ভদ্রেশ্বর মৌজার অধীন। দুই নদীসঙ্গমের পূর্ব পারের গ্রামটির নাম শিবচণ্ডী, মৌজা ঝালিঙ্গী এবং পশ্চিম পারের গ্রামের নাম ভদ্রেশ্বর। শিবচণ্ডী ৭ নাম্বার দেবনগর ইউনিয়নের অধীনে। অপরদিকে ভদ্রেশ্বর ৬ নাম্বার ভজনপুর ইউনিয়নের অধীনে। উভয় উপজেলা তেঁতুলিয়া, জেলা-পঞ্চগড়। সাউ বা সাউন উৎসস্থল থেকে বাংলাদেশের সীমানা পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ। বাংলাদেশের মধ্যে সাউ নদীর দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৭ কিলোমিটার পথ উভয় দেশের সীমানা রচনা করে এগিয়েছে। মাত্র এক কিলোমিটার সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঝালিঙ্গী নামক স্থানে এসে করতোয়ার সাথে একত্রিত হয়েছে। সাউ নদীতে সারা বছর স্রোত থাকে। বর্ষাকালে এর প্রশস্ততা ৫০ গজ এবং গভীরতা গড়ে ১২ ফুট। শুষ্ক মৌসুমে প্রশস্ততা ৩০ গজ এবং গড় গভীরতা ৫ ফুট। নির্মল পানি। তিন ফুট গভীরে মাছ চলাচলের দৃশ্য দেখা যায়। পূর্বে (ব্রিটিশ সময়ে) এই নদী দিয়ে বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের শালকাঠ নৌকাযোগে ভজনপুর বন্দরে আনা হত। বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য থেকে জোড়াপানি (জুরাপানি) নামক আরেকটি নদী উৎপত্তি লাভ করে ভক্তিনগর থানা এলাকায় সাউন নদীর সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং সাউন বা সাউ নামে বাংলাদেশের সীমান্ত অভিমুখে এসেছে। বহু যুগ পূর্বে জোড়াপানির উৎস ছিল সিকিমের পাহাড়ি এলাকা। সাউ নদীতে বোয়াল, আইড়, গাগৌর ইত্যাদি নানা জাতের মাছ পাওয়া যায়। রাইচ্যাঙ নামে স্থানীয় জাতের একটি মাছ দেখতে অনেকটা মৃগেল মাছের মত। বর্ষাকালে উজানের দিক থেকে আসে। সাদা বর্ণের এই মাছ সর্বোচ্চ এক ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। উটা নামের আরেক বিশেষ জাতের মাছ সাউ নদীতে পাওয়া যায়। এই মাছটি দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মত।

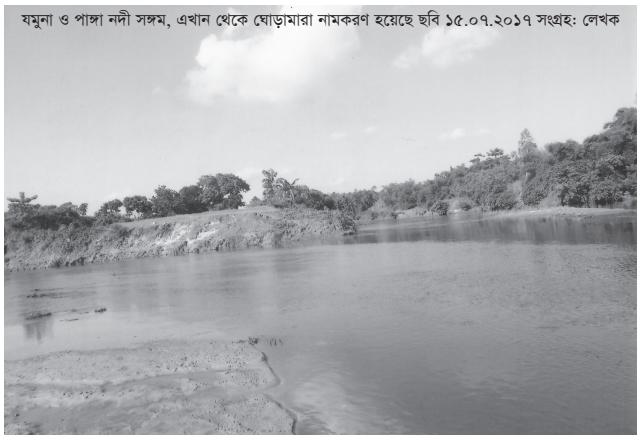
যমুনা ও পাঙ্গা নদী সঙ্গম, এখান থেকে ঘোড়ামারা নামকরণ হয়েছে ছবি ১৫.০৭.২০১৭ সংগ্রহঃ লেখক

২০. ভাতা

ভাতা নদীর উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ এবং পতিত হয়েছে ভারতে। পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের বিলাঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করেছে ভাতা নামের একটি ক্ষুদ্র নদী। উৎপত্তিস্থল থেকে প্রথমে উত্তর-পশ্চিমমুখী হয়ে এক কিলোমিটার এগিয়েছে। এরপর দক্ষিণমুখী হয়েছে। এভাবে আরও এক কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর পশ্চিমমুখী বাঁক নিয়ে আরও এক কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে ভারতের সীমান্তে প্রবেশ করেছে। ভাতা নদী বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলাধীন ইসলামপুর মহকুমার চোপড়া থানা এলাকায় প্রবেশ করেছে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবাহপথ ধরে। এভাবে প্রায় ১২ কিলোমিটার পথ অগ্রসর হওয়ার পর চাপড়া নামক বাজারকে পূর্ব দিকে রেখে সোজা দক্ষিণমুখী অবস্থায় আরও প্রায় ২০ কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা বাংলাদেশের নদী বেরংয়ের সাথে মিলিত হয়েছে। ভাতা নদীর দৈর্ঘ্য বাংলাদেশে মাত্র ৩ কিলোমিটার। অপরপক্ষে ভারতের মধ্য দিয়ে নদীটি বয়ে গেছে প্রায় ৩২ কিলোমিটার। এই নদীর উভয় পারেই অনেকগুলো চা বাগান রয়েছে।

২১. সংকোশ

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের তালিকা থেকে বাদ পড়া আরেকটি অভিন্ন নদী সংকোশ। ভারতের আসাম রাজ্যের ধুবরী জেলাধীন গোলকগঞ্জ থানা এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গাধর নামক নদ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে সংকোশ নদ। সংকোশ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে কুড়িগ্রাম জেলার সর্ব উত্তরে অবস্থিত ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন চরভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের অন্তর্গত ভোয়ালকুরী নামক গ্রামে। বাংলাদেশে প্রবেশের মুখে ভারতের শেষ গ্রামটির নাম বিষখাওয়া। সংকোশ উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী প্রবাহপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ অবস্থায় নদীর পশ্চিম পারে বাংলাদেশের বঙ্গসোনাইহাট বিজিবি ক্যাম্প এবং স্থলবন্দর। স্থলবন্দরের স্থানটি টোকসা নামে পরিচিত। নদীর পূর্ব পারে গোলকগঞ্জ থানাধীন গাইখাওয়া বিএসএফ ক্যাম্প। এই স্থান থেকে সংকোশ প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী অবস্থায় বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা রচনা করে। এরপর সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে পশ্চিমমুখী বাঁক নিয়ে। এ অবস্থায় সংকোশ নদের উত্তর পারের গ্রামটির নাম শোভারকুঠি, ইউনিয়ন-কেদার এবং দক্ষিণ পারের গ্রামটির নাম ঝিংজিরাবালা, ইউনিয়ন কচাকাটা। ঝিংজিরাবালা গ্রামে রয়েছে কচাকাটা বিজিবি ক্যাম্প। নদীর ওপারে ভারতের বিএসএফ ক্যাম্পের নাম কশাল। সংকোশ এরপর বলভের খাস ইউনিয়ন এলাকার মধ্য দিয়ে মাদারগঞ্জ নামক নদীবন্দরে এসে পুনরায় গঙ্গাধরে পতিত হয়েছে। এই নদীর ওপর ৬০ মিটার দীর্ঘ একটি পাকা সেতু রয়েছে। সংকোশের দৈর্ঘ্য বাংলাদেশ অংশে মোট ১০ কিলোমিটার। সংকোশে সারা বছর পানি থাকে। শুষ্ক মৌসুমে নদীটি ৩০ গজ প্রশস্ত এবং গভীরতা ৪ ফুট। সংকোশ একাধারে গঙ্গাধর নদের শাখা, অপরদিকে উপনদ।

মাহবুব সিদ্দিকী: নদী গবেষক
৭৬, শিরইল, রাজশাহী।